OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 460 - 466
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

অনিল ঘড়াই-এর ‘প্লাবন’ : গণজীবনের বিপর্যয়

আজিমুদ্দিন মণ্ডল
গবেষক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suraj.jarur@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Bourgeois, Political polarization, Femininity, Personal politics, Post – Independence era, Exploitation.

Abstract
Anil Gharai’s ‘Plaban’ is written about the Disaster of public life, The deceit of the bourgeois minded, degradation of their values, corrupt mentality, political polarization, women’s femininity, their social status and deprivation-exploitation. As we know, the Tristar Panchayat system was introduced in West Bengal in 1973 for the purpose of rural development. Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad. The responsibility of managing the Gram Panchayat rests with the Pradhan and Upa-Pradhan. They are the ones who control the fate of the people of the village. So, after achieving the goal all these heartbreakers do not sit idly by. Then a kind of aggressive attitude is born in their mind. People's happiness and peace is destroyed by the violence and brutality of these so-called people’s leaders with an aggressive attitude. Storyteller Anil Gharai has brought before us through the story of Chaitir’s family how endangered the people of Palli are in the trap of personal politics in the post-independence era[5] where there is no ideology. In the novel, a tone of awakening of the village people who are suffering from the exploitation[6]-persecution-torture of Pradhan is also heard.

Discussion

ভারতীয় উপমহাদেশের দলিত-আদিবাসী-অন্ত্যজ জনজীবনের কথাকার হলেন অনিল ঘড়াই। যুগ যুগ ধরে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল শোষণের যজ্ঞে শামিল থাকার কারণে যাঁদের মাথার উপর ছাঁদ নেই, যাঁদের পায়ের তলায় মাটি নেই, সেইসব শোষিত মানুষেরই কথাকার হলেন তিনি। দেশের নব্বইজন যেখানে বাস করে সেই পল্লি-বাংলায় কবির ঘর; যে পল্লি-বাংলার মানুষ মামলা-মোকদ্দমা, বাদানুবাদ এবং আত্মগরিমার বিজ্ঞাপন প্রচার করে না। মনে অনেক আগ্রহ নিয়ে তিনি তাঁদের আঙিনায় ছুটে গেছেন এবং তাঁদের বহু সুখ-দুঃখের-দৈন্যের কাহিনি শুনেছেন। দূর থেকে দেখা পল্লবগ্রাহিতা নয়; জীবনের মূল্যে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞান-কান্না, ঘাম-রক্তে রঞ্জিত অনুভূতি-উপলব্ধিই তাঁর লেখনীর চালিকাশক্তি। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যজগতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে একদিকে যেমন দেখতে পাব পল্লি-বাংলার সরল-বিশ্বাসপরায়ণ মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, কৃষ্টি-কালচার অন্যদিকে তেমনই স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের ব্যক্তিসর্বস্ব রাজনীতি যেখানে আদর্শের বালাই নেই সেই ব্যক্তিসর্বস্ব রাজনীতির যূপকাষ্ঠে পল্লিবাসীরা কতটা বিপন্ন সেই হৃদয়বিদারক চিত্রও সমানভাবে আমাদের গোচরীভূত হয়। নিজের লেখালেখি জগতের কথা বলতে গিয়ে কথাকার জানান -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "দারিদ্রের মধ্যে যারা বেড়ে ওঠে তাদের গায়ে কষ্টের শ্যাওলা জমা থাকে। শ্যাওলাহীন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বিলাসিতার ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠিনি বলেই হয়তো আমার মনটা এখনও তাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই, তথাকথিত সফিস্টিকেটেড মানুষ যাদের বলা হয় তাদের নিয়ে এখনও লিখতে পারিনি, এটা আমার অক্ষমতা। আর এই অক্ষমতাকে সম্বল করে আমার চরিত্ররা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে, আমাকে সাহস প্রদান করে।"[১]

অর্থাৎ সাবল্টার্ন তথা প্রান্তিকের বহুস্তরীয় স্বরকে ভাষা দিয়েছেন অখ্যাত, শোষিত শ্রেণির কথাকার অনিল ঘড়াই। 'প্লাবন' সেই ধারারই বলিষ্ঠ উপন্যাস।

আমরা জানি, 'গ্রামন্নোয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ। গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় প্রধান ও উপপ্রধানের উপর।'[২] মূলত গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই প্রধান ও উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে গ্রামের হর্তাকর্তা হয়ে বসে। তাদের হাতেই থাকে গ্রাম শাসনের ভার। গ্রামের মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা তারাই। কাজেই লক্ষ্য পূরণের পর অর্থাৎ পদপ্রাপ্তির পর এই সমস্ত হর্তাকর্তারা কিন্তু হাতগুটিয়ে বসে থাকে না। তখন তাদের মনের ভেতরে জন্ম নেয় একধরনের আগ্রাসি মনোভাব। এই আগ্রাসি মনোভাবাপন্ন মানুষেরই হিংস্রতায়-নৃশংসতায় নষ্ট হয়ে যায় মানুষের সুখশান্তি। তাদের ক্ষমতার আগুনে পল্লিবাসীর ছন্দময় জীবনের সব কিছুই হয়ে যায় ছারখার। আমাদের আলোচ্য 'প্লাবন' উপন্যাসের প্রতিবেদনেও মূলত এইসব ক্ষমতাবান গ্রামপ্রধানের হিংস্রতায়-নৃশংসতায়, ক্ষমতার মদমত্ততায় কীভাবে একটি পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরটিকেও তুলে ধরতে ভোলেননি এই জনদরদি কথাকার।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষ এক সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই ভারত নামক রাষ্ট্র বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুষের সমবায়ে গঠিত এক বৈচিত্র্যময় ভারত। সংহতি, একতা, ঐক্যবদ্ধতা ভারত রাষ্ট্রের মূল মন্ত্র। কিন্তু কর্তৃত্ববাদীদের দাম্ভিকতা, হৃদয়হীনতার জন্য এই পরম্পরা থেকে ভারত আজ বিচ্ছিন্ন। বৈষম্য এইটাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, শোষকের বাড়ি তেতলা আর শোষিতের ঘরে চাল নেই। এই ভারতের মাটিতেই একশ্রেণির মানুষ বসবাস করে যাঁদের দিন শুরু হয় বেঁচে থাকার উপযোগী খাদ্যসংস্থানের স্বপ্ন দিয়ে। উপন্যাস শুরু হয়েছে এমন এক ব্রাত্য পরিবারের কথা দিয়ে। মনসার তিন ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে সংসার। বড় ছেলে দুলে সংসারের কোনও দায়িত্ব পালন করতে অপারগ। মেজো ছেলে হেলেও বিয়ের পর বউ নিয়ে আলাদা থাকে। তাই বাধ্য হয়ে পিতার মৃত্যুর পর মনসার সঙ্গে সংসারের হাল ধরতে হয় ছোটো ছেলে কেলেকে। পিতার ফেলে যাওয়া কামারশালাটাই তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ক্ষুধা আর ক্ষুধার বিরুদ্ধে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা যে সকলেই শ্রমজীবী, বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা কায়িক শ্রমই যে তাঁদের জীবিকার মুখ্য মূলধন এই বিষয়টিকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মনসার একমাত্র মেয়ে চৈতিও সংসারের ভাঙা হাল ধরতে দিদিমণির বাসায় কাজ করতে যায়। মাস গেলে ঝি-গিরির দরুন ত্রিশ টাকা সে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারে। এই চৈতিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবন যে এখনও কণ্টকময় তার প্রমাণ চৈতির জীবনকাহিনি। গ্রাম হোক কিংবা শহর এখনও যে নারীর স্বাধীনভাবে চলাফেরার পরিবেশ তৈরি হয়নি, নারীবিদ্বেষী পুরুষ এখনও যে নারীকে একমাত্র কাম নিবারণের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে, নারীর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা শব্দটি যে এখনও বাক্সবন্দি তার প্রমাণ চৈতির জীবনকাহিনি। এই চৈতি বোবা। অভাব ওকে কাজের মেয়েতে পরিণত করলেও তাঁর মধ্যে রূপের বাহার আছে। আর তাঁর এই বিমল সৌন্দর্যই তাঁর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্রামপ্রধানের ছেলে মাকুন্দ তাঁকে ভোগ করতে চায়। কেননা তার ধারণা যাঁরা ছোটোলোক তাঁদের সসম্মানে বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। ক্ষমতাবানরা যেভাবে তাঁদের চলতে বলবে তাঁদের সেভাবেই চলতে হবে। আর এখান থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত সমাজের দ্বন্দ্ব। কিন্তু চৈতির মানসম্মান যথেষ্ট। হররোজ-হরবেলা তাঁকে কেউ কুচোখ দিয়ে দেখবে তেমন নীচ মানসিকতাকে সহ্য করার মানসিকতা চৈতির নেই। সে একবেলা না খেয়ে থাকবে, তবুও নিজের মানসম্মান বিকিয়ে দেবে না কারও কাছে এমন দৃঢ়চেতা নারী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের সতর্ক পাহারাদারিকে উপেক্ষা করে চৈতির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা। তাঁকে একসময় হার মানতে হয়।

কামারশালা কেন্দ্রিক জীবিকার মধ্যে শরীরের সব পরিশ্রম দিয়ে শুধু দু-বেলা দু-মুঠো ভাতের সংস্থান হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু টাকা জমিয়ে রাখার মতো পেশা নয় এটা। আর তাইতো আমরা দেখি, চৈতির মা মনসা একসময় প্রচণ্ড জ্বর, কাশি আর বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো অসুস্থ মনসাকে সদরে নিয়ে গিয়ে ফটো তোলার জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন সেটাও কেলের হাতে থাকে না। পানতা ভাত আর সজনে শাকের ভাজি খেয়ে যাঁদের বছরের অধিকাংশ দিন কাটে তাঁরা কীভাবে এক রোগীকে সুপথ্য তুলে দেবে! তবুও তাঁরা মাকে সুস্থ করে তোলার জন্য গুগলির ঝোল আর ভাতের ব্যবস্থা করার কথা ভাবে। সেইমতো চৈতি যায় গুগলি তুলতে পুকুরে-

> "গুগলি তোলা মহা ঝক্কির কাজ। মাজা লেগে যায় তবু কোঁচড় ভরে না।"[৩]

ঠিক এই সময় লম্পট মাকুন্দ তাঁদের অভাবের সুযোগ নিয়ে চৈতির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এটা ছিল তার ছল। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী চৈতি মাকুন্দর সেই কু-মতলবের আঁচ পেয়ে তার দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দেয়। সঙ্গে-

> "মাকুন্দ হয়ত ভেবেছিল চৈতি টাকাগুলো ছোঁ মেরে নেবে। কিন্তু তার ধারণা ভুল। ছোঁ মেরে টাকাগুলো নিল না চৈতি, এগিয়ে এসে থুঃ করে ছুঁড়ে দিল থুতু। হাওয়ায় সেই থুতু উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল মাকুন্দর মুখে।"[৪]

বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী মাকুন্দ চৈতির এহেন আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তাই সে মনে মনে ছক কষে কীভাবে চৈতিকে বাগে আনা যায়। এদিকে কেলে কোনোভাবেই অভাবের পুকুর থেকে পরিবারকে তুলে আনতে পারে না। আসলে ভারতীয় রাজনীতির মেরুকরণের শিকার তাঁরা। সৌধের বাসিন্দাদের অখণ্ড সুবিধাভোগকে যেনতেন-প্রকারেণ ভাবে বজায় রাখাই ভারতীয় রাজনীতির মূল পরিচায়ক হওয়ায় যাঁরা শ্রমিক-কুলি-কামিন তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত কোনও রাষ্ট্রীয়নীতি না এক্ষেত্রে আমাদের চোখে পড়ে না এবং -

> "এই স্থিতাবস্থা বজায় রেখেই পশ্চিমবাংলার সমাজ টিকে আছে। একদিকে দরিদ্র পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলি বিপুল সংখ্যায় সুবিধা বঞ্চিত, অন্যদিকে খুবই ছোট একটি অংশের প্লাজা, শপিং মল, টেকনোলজি পার্ক, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ, যাবতীয় জাগতিক বৈভবগুলির উপর অবিচল অধিকারটি সুনিশ্চিত রাখা। সরকার যেমন এই অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি বিরোধী রাজনীতির যে প্রধান ধারা সেটিও এদেরই প্রতিনিধি।"[৫]

আর এই সুযোগকেই কাজে লাগায় মাকুন্দ। সে কেলেকে একশো টাকা ধার দিয়ে তাঁর মন জয় করে ফেলে। কেলে মাকুন্দর মতলবের কথা জানতে না পারলেও চৈতির তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

এদিকে মনসা সুস্থ হয়ে উঠলে একঘেয়েমি জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনার জন্য চৈতিকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়। মনসা ভেবেছিল হয়তো রামায়ণ-মহাভারতের বীরত্বমূলক কোনো অংশের অভিনয় হবে। কিন্তু এ যে উলটো রামায়ণ! পর্দায় অশ্লীল দেহভঙ্গি করে নেচে চলে চৈতির বয়েসী একটা মেয়ে, তা দেখে লজ্জায় চোখ নামিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকে মনসা। একসময় মনসা মেয়ে চৈতিকে সেখানে রেখে এসে একা একা বাড়ি ফিরে আসে। এদিকে শো শেষ হতে রাত্রি প্রায় গভীর হয়ে যায়। এই নিশিরাত্রের অন্ধকার ভেদ করে মা-হীন চৈতিকে একা একা বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে হয়। চৈতি পাকুড়তলার ঢালু পথ বেয়ে যখন যাচ্ছিল তখনই তাঁর সামনে এসে হাজির হয় মাকুন্দ। চৈতির আর বুঝতে বাকি থাকে না চাঁদের আলো আর কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে আগুন হয়ে পুড়িয়ে দেবে এবং দেয়ও। মাকুন্দ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় বাঁধের নীচে। সেখানেই চলে তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "চন্দ্রালোকে সবুজ প্রকৃতির বুকে পর্যায়ক্রমে ধর্ষিতা হল সে। জ্ঞান হারাবার আগে সে দেখল তার নগ্ন দুই জাং ভিজিয়ে রক্তের ঢল নামছে মাটিতে।"[৬]

মাকুন্দ তাঁর সতীত্বের পাপড়িগুলো নষ্ট করে দেয়। শুধু মাকুন্দ নয়, মাকুন্দর অপর দুই লম্পট বন্ধু পরিমল এবং মাধবও। বিকৃতকাম দুরাত্মারা যে এভাবেই শত শত নারীর জীবনকে অনাদিকাল ধরে নরকে পরিণত করে চলেছে তার একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। শঙ্খ ঘোষ একদা তাঁর 'আমরা মেয়েরা' কবিতায় ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীশোষণের এই চিত্র দেখে বলেন যে, -

> "লিখে যাই জলের অক্ষরে/আমার মেয়েরা আজও অবশ ভিক্ষার হাতে পড়ে আছে সব ঘরে ঘরে।"[৭]

এভাবেই যুগে যুগে নারী আধিপত্যবাদী প্রতাপবর্গের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। নারীমাংসলোলুপ পুরুষ আজও ব্যাধের ভূমিকায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমস্ত পরিসর ও অবকাশ রুদ্ধ।

এক সহায়-সম্বলহীন পরিবারের নারী চৈতি সমাজরক্ষকদের হাতে বাঁধের ধারে নিজের সতীত্ব হারিয়েও ন্যায়বিচার পায় না। আসলে জোর যার মুলুক তার। মাকুন্দর পিতা একজন গ্রামপ্রধান। সে ক্ষমতালোভী-অর্থলোভী-পদলোভী একজন নেতা। চরিত্রটির পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় সমালোচক যা বলেছেন তাতে আমাদের বুঝে নিতে সমস্যা হয় না যে, তিনি একজন রাজনীতির ছত্রছায়ায় পুষ্ট স্বার্থগৃধ্নু, পরপীড়ক, বিবেকহীন, মনুষ্যত্ববিবর্জিত এক নেতা -

> "আমাদের দেশের ভোটের রাজনীতিতে বা ক্যারিয়ারিস্টিক রাজনীতিতে নব্বই ভাগ নেতা যাদেরকে আমরা জনপ্রতিনিধি বলি তাদের চরিত্রের ঠিক নেই। আশিভাগ জেলফেরত বা কোথাও না কোথাও মামলা ঝুলছে। এ দেশে ভোট নেওয়া হয় মানুষকে বোকা বানিয়ে বা ভয় দেখিয়ে। সে দেশের উন্নতি কোথা থেকে হবে? মুরলীধরবাবুও এই ধরনের একজন বিত্তবান নেতা। যিনি তার বিত্তের পাহাড়টাকে বাড়িয়েই যাচ্ছেন।"[৮]

এহেন মানুষকে থানার ছোটোবাবু পর্যন্ত সমীহ করে চলে। অবশ্য মুরলিধরবাবুকে সমীহ করার পেছনে আরও নানান কারণ আছে। মাকুন্দর পিতা মুরলিধরবাবুর বিশাল পুকুরে হুইল নিয়ে মাছ ধরতে যায় থানার ছোটোবাবু। শুধু মাছ নয়, আরও অনেক কিছু পান তিনি। তাই থানার ছোটোবাবু ন্যায়ের পক্ষ না নিয়ে অন্যায়ের সাথে হাত মেলায়। অর্থের কাছে মাথানত করে মানুষের ন্যায়-বিবেকবোধ-মূল্যবোধ। তাইতো আমরা দেখি, কেলে দারোগার সামনেই হাত নেড়ে নেড়ে প্রতিবাদ জানালে তাঁর সেই প্রতিবাদ মুখ তুবড়ে পড়ে। সমাজের এই অধঃপতিত চিত্র দেখে মনসা সেখান থেকে পালিয়ে আসার জন্য ছেলেকে বলে -

> "এই সোনার দেশ এখন ছাই হয়ে গিয়েছে, এদেশে বুক ফাটলেও তোর মুখে কেউ একফোঁটা জল দেবে না!"[৯]

একদিকে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা অন্যদিকে বোনের বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত অবস্থা কেলেকে গভীর মানসিক আঘাত দেয়। তাই আবার কেলে সুবিচারের জন্য দারস্থ হয় সমাজের মাথাওয়ালদের কাছে। একমাত্র বোনকে সে সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসিয়ে গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের দোরে-দোরে ঘোরে। সবাই মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও কিন্তু কাজের কাজ কেউ করে না। বোবা বোনকে ন্যায়বিচার না দিতে পেরে বিশাল ব্যর্থতার পাহাড় জমে যায় কেলের বুকের ভেতর। সেই ব্যর্থতাই একসময় তাঁকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলে -

> "যদি পাগলা কামারের রক্ত তার গায়ে থাকে তাহলে এই চরম অপমানের বদলা নেবে সে। বোনের ইজ্জত যে বাঁধের ধারে মিশিয়ে দিয়েছে তাকে সে ছেড়ে কথা বলবে না। যে কোন শর্তে বদলা নেবে সে।"[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোমরে ধারালো হেঁসো গুঁজে কেলে দোকানপাট ভুলে টো টো করে ঘুরে বেড়ায় বাঁধের উপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে -

> "প্রতিহিংসার গোঁ কেলেকে স্থির থাকতে দেয় না কোন সময়। মাথার ভেতরটা সব সময় ভার হয়ে আছে তার।"[১১]

অসম লড়াইয়ে ভয়-ভীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে কেলে অপেক্ষায় থাকে আক্রমণের। একসময় সুযোগ পেয়েও যায়। মাকুন্দ তার সঙ্গীদের নিয়ে আম-কাঁঠালের বনমধ্যে অবস্থিত পথ ধরে বাড়ি ফেরার পথে অগ্রসর হলে কেলে তাক করে অস্ত্রটা ছুঁড়ে দেয়। মাকুন্দ তা দেখতে পেয়ে চকিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে। হেঁসোটা গিঁথে যায় আমগাছে। ওরা তিনজন, সে একা। তাই কেলের হার হয়। তিন ব্যাটারির টর্চের আঘাতে কেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে গভীর জঙ্গলে। বোনের ধর্ষণকারীকে শাস্তি দিয়ে গিয়ে নিজেই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়। মাথায় বাইশটা সেলাই নিয়ে সে কোনোরকমে প্রাণে বাঁচে। জ্ঞান ফেরার পর হাসপাতালেই কেলে তাঁর এই অবস্থার জন্য যে দায়ী সেই মাকুন্দর কথা আকারে-ইঙ্গিতে জানায়। চৈতির ধর্ষিত হবার ঘটনাও সে জোর গলায় বলে। কিন্তু বিচার পায় না। কেননা থানা-পুলিশ একশ্রেণির মানুষের কুক্ষিগত। যাবতীয় ক্ষমতাও একশ্রেণির মানুষের হস্তগত। তারা এভাবেই বিরুদ্ধ স্বরকে দমিয়ে রাখে। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ তাদের হৃদয়কুঞ্জে স্থান পায় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন -

> "...আমাদের শাসন কাঠামোকে যতই গণতান্ত্রিক বলে দাবি করা হোক না কেন, অন্যের কথা শোনার ঐতিহ্যকে পুষ্ট করার বদলে দুর্বল করা হয়েছে। বাঙালি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ক্ষুদ্র এক উন্নাসিক গোষ্ঠী, যেটি ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে নিজেকে তথাকথিত আলোকায়নের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেই সুবাদে সে যাবৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষমতার উপর একাধিকার স্থাপন করেছে।"[১২]

শুধু চৈতির পরিবারই নয়, ক্ষমতার অলিন্দে বসবাসকারী ক্ষুদ্র এক উন্নাসিক গোষ্ঠীর কাছে বাংলার পঁচাশি শতাংশ জনসাধারণের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরার কোনও মূল্য নেই; তাঁদের প্রাণের কোনও মূল্য নেই।

পাকা একমাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় কেলে। কিন্তু সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে সে আর ফিরে আসতে পারে না। অন্যদিকে কিন্তু যারা মনসার পরিবারের এহেন দুরবস্থার জন্য দায়ী তারা দিব্যি মাথা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের বুড়ো বটতলায় তাদের আড্ডা। গ্রামসমাজ ধিক্কারে জাগ্রত হলেও এতে মাকুন্দ বা মুরলিধরবাবুর কোনও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মনসার পরিবারের অনেক কিছু যায় আসে। কেননা কেলে ছিল মনসার পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস। তিনমাসের উপর হল সে দোকান খোলে না। তাঁর যে একটা কামারশালা আছে এটা সে বেমালুম ভুলেই যায়। ফলে মনসার ঘাড়ে সব দায়িত্ব এসে পড়ে। মনসা ছিল ঘরের বউ, এখন হয়েছে চাকরানি। পরের দোরে দোরে গিয়ে এঁটো বাসন না ধুলে তাঁর হাঁড়ি চড়ে না -

> "দিন চলে যায়, কিন্তু পেট চলে না তার। তিন বাড়িতে এখন বাসন মাজে মনসা।"[১৩]

আমাদের সমাজে দুই ধরনের মানুষ বাস করে। একশ্রেণির মানুষ টাকা এবং পদের লোভে ভুলে যায় মানবিকতা, তারা মানুষের ক্ষতি করে দিব্যি মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামপ্রধান মুরলিধরবাবু ও তার ছেলে মাকুন্দ তার উদাহরণ। আর একশ্রেণির মানুষ সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখে। তাঁরা সর্বশক্তিমান শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মনে মনে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রজত সেই দলের। গ্রামের কেউ যখন এক সহায়-সম্বলহীন পরিবারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না তখন এই রজত এগিয়ে আসে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। শুধু তাই নয় -

> "এক মাস ছুটিতে এসে রজত এবার অনেক বেশি সময় ঘরের বাইরে কাটাচ্ছে। গ্রামের অতি সাধারণ-দরিদ্র মানুষগুলোর সঙ্গে তার ওঠা-বসা।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রজত তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দরিদ্রপল্লিতে গিয়ে তাঁদের দুঃখ-বেদনার কথা শুনে। তাঁদের সঙ্গে হওয়া অন্যায়-অবিচারের কথা শোনে। সব কিছু শুনে রজতের দল শোষকশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে -

> "এই কালো কালো লেখাগুলো থানার দারোগাকে ভয় পাইয়ে দেবে।"[১৫]

এঁরা সবাই ছিল সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের সপক্ষে। এঁরা সমাজসংস্কারক। রাইচরণ সিদ্ধা যথার্থই বলেছেন -

> "তোমাদের অত্যাচারে আজ আমরা মরিয়া
> তাই দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে -
> প্রতিবাদের আগুন।"[১৬]

এই প্রতিবাদের আগুন যে শোষকশ্রেণির ঘুম উড়িয়ে দেবে তা তো বলাই বাহুল্য। রজতের দলের কর্মকাণ্ড আমাদের জানিয়ে দেয় যে, একমাত্র বঞ্চিত কণ্ঠের প্রতিবাদই সমাজ পরিবর্তনের অস্ত্র। সকল প্রতিবাদী কণ্ঠই চেতনার দ্বারা জাগৃত হয়। মানুষ মানুষের প্রতি চিরায়ত বঞ্চনার বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে স্লোগান দেয়। রজতের দলের প্রতিবাদ ঠিক এমনই। মনসার পরিবারের উপর হওয়া অবিচারের কথা শুনে তাঁরা অপেক্ষা করে বুকে একরাশ প্রতিবাদের আগুন নিয়ে।

রজতের দলের কর্মকাণ্ড প্রশাসন ভালো চোখে দেখে না। শুরু হয় ধরপাকড়। ফলে পুলিশের জুলুমে রজতকে সাময়িকভাবে গ্রাম ছাড়তে হয়। গ্রাম ছাড়লেও সে আবার সন্ন্যাসীর রূপ ধরে গ্রামে ফিরে আসে চৈতির সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। প্রথম লক্ষ্য তাঁর মাকুন্দ। প্রথম গুলিটাতেই সে মাকুন্দর বুক ঝাঁঝরা করে দিতে চায়, তারপর অন্য ভাবনা। সুযোগ পেয়েও যায়। গ্রামের পুব পাড়ায় বাঁধ ভেঙে গেলে মাকুন্দ তার দলকে নিয়ে সেখানে যায় লোকদেখানোর জন্য যে, তারা মানুষের দুঃখে সমব্যথী -

> "আজকাল শো না করলে মানুষের মন পাওয়া যায় না। আর মানুষের মন না পেলে ভোটের নৌকো ডাঙায় তোলা যায় না।"[১৭]

কিন্তু এই শো-ই তার জীবননাট্যের শেষ শো হয়ে যায়। মাকুন্দ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বাঁশঝাড়ের কাছে মদ খেত গেলে রজত নিমেষে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর ফায়ার। গুলির আঘাতে কাদাভর্তি বাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ে মাকুন্দ। মাকুন্দর সঙ্গে পরিমলকেও সে গুলি করে খুন করে। থানার ওসি থেকে শুরু করে মুরলিধরবাবুও হিসাব মেলাতে পারে এটা কার কাজ। এ যেন শোষক শ্রেণির বা বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত সমাজের সশস্ত্র প্রতিবাদ। আজ ক্রমশ কোটি কোটি নিম্নবর্গ ও অসাম্মনিত মানুষের মধ্যে এই বিপ্লবী বিদ্রোহ-ই শ্রেণিসংঘাতের মোড় নিচ্ছে।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শোষণের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে যশস্বী হয়ে আছে। পল্লিবাসী দরিদ্র জনগণের স্বাধীনতা যে এখনও একশ্রেণির ঔদ্ধত্য মানুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রেখেছে আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিবেদনেও আমরা তার ছায়াচিত্র লক্ষ করি। নিম্নবর্ণের মানুষ কীভাবে যুগের পর যুগ ধরে সমাজপতিদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছে, বিপন্ন হয়েছে, পদানত হয়েছে তারই আলেখ্য নির্মাণ করেছেন অনিল ঘড়াই তাঁর আলোচ্য উপন্যাসে। সেসঙ্গে তিনি তাঁদের জাগরণের দিকটিকেও তুলে ধরতে ভোলেননি। পল্লিবাসীরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে একমাত্র সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমেই-এই সত্যকে সুকৌশলে উপন্যাসের ন্যারেটিভে গেঁথে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। আর এভাবেই তিনি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত এই দুই সমাজের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাকে আলোচ্য উপন্যাসের ন্যারেটিভে তুলে ধরেছেন।

Reference:

১. মাঝি, সুনীল ও ভবেশ বসু (সম্পা.), অনিল ঘড়াই পরিক্রমা, তূর্য, ২০১৫, পৃ. ৪২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 460 - 466
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২.https://prd.wb.gov.in/services/resources/Patrikas/mm_638181921066367215.pdf,Accesson 19.12.2024
at 06.49 PM
৩. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ২৫
৪. তদেব, পৃ. ২৬
৫. রাণা, কুমার, শিক্ষা ও রাজনীতি, আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ২৬
৬. তদেব, পৃ. ৩৩
৭. ঘোষ, শঙ্খ, আমরা মেয়েরা, কবিতা সংগ্রহ-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৯৭, পৃ. ১৭২
৮. জানা, সুস্নাত, ভবেশ বসু, শঙ্খশুভ্র পাত্র ও সুনীল মাঝি (সম্পা.), পাতা ওড়ার দিন : একটি ব্যক্তিগত আলোচনা (সত্যজিৎ ঘোষ), শাশ্বত ছিন্নপত্র : অনিল ঘড়াই সংখ্যা, মেদিনীপুর, ২০০৪, পৃ. ১৫২
৯. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ৩৪
১০. তদেব, পৃ. ৩৮
১১. তদেব, পৃ. ৩৯
১২. রাণা, কুমার, প্রান্ত ও কেন্দ্র, আধিপত্য ও লোকপ্রজ্ঞা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ৯৫
১৩. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ৪৬
১৪. তদেব, পৃ. ১৯
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, দলিত সাহিত্যের দিগ্‌বলয়, একুশ শতক, ১৯৯২, পৃ. ৪৫
১৭. ঘড়াই, অনিল, প্লাবন, সিংভূম সাহিত্য, ১৯৯৪, পৃ. ৬০